

## প্রথম অধ্যায়

# কর্ম ও মানবিকতা

এই অধ্যায় পড়ে আমরা শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে জানব। কায়িক ও মেধাশ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কেও ধারণা পাব। আরও জানতে পারব কীভাবে আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করা যায়। আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা আমাদেরকে কাজে সাহায্য করে। এভাবে আমাদের কাজের মানও বৃদ্ধি পায়।



এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- শ্রমের মর্যাদার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কাজের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কাজের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাশীল, আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল হতে আগ্রহী হব।
- শ্রমের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করব।
- নেতৃত্ব প্রদানের সাথে সাথে নেতৃত্ব আচরণে উদ্বৃদ্ধ হব।
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

## পাঠ ১ : কায়িক শ্রমের গুরুত্ব

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কায়িক শ্রম কী? কায়িক শ্রম হলো শারীরিক পরিশ্রম। আমরা প্রতিদিন নানা কাজ করে থাকি। এসব কাজ করতে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম হয় অর্থাৎ এসব কাজের ক্ষেত্রে আমরা কায়িক শ্রম দিয়ে থাকি।

অনেকে কায়িক শ্রম দিয়ে টাকা রোজগার করে থাকে। যেমন-রিকশাচালক, ভ্যানচালক। তোমরা নিশ্চয়ই রিকশা দেখেছো - রিকশাচালক আরোহীদের নানা স্থানে পৌছে দেন। রিকশা চালানো কায়িক শ্রমের একটি উদাহরণ। এছাড়াও আরও অনেক কাজ আছে যেসব কাজে আমাদের কায়িক শ্রম দিতে হয়।

### কাজ

কায়িক শ্রম প্রয়োজন হয় এমন আরও ৫টি উদাহরণ নিজের খাতায় লিখ এবং উদাহরণগুলো বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। প্রয়োজনে শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারো।

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো - ফসলের খেতে যারা কাজ করেন তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। যারা গ্রি ফসল থেকে আমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদান করেন, তারাও অনেক শারীরিক পরিশ্রম করেন। আমাদের সমাজে নানা পেশার মানুষ রয়েছেন; যেমন- কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে ইত্যাদি। তারা সবাই নিজ নিজ কাজ করেন বলেই আমরা আরামদায়ক জীবন-যাপন করতে পারি।

একবার ভেবে দেখত, কৃষক যদি আমাদের জন্য কষ্ট করে ফসল না ফলাতেন তবে আমরা কী খেয়ে থাকতাম? জেলেরা যদি পরিশ্রম করে আমাদের জন্য মাছ না ধরতেন তাহলে কি আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি হতে পারতাম? তাঁতি ও দর্জিরা যদি আমাদের জন্য পোশাক তৈরি না করতেন তা হলে আমরা কী পরতাম? তোমরা কি কখনো তাঁতির কাপড় বোনা দেখেছো? দেখেছো দর্জি কীভাবে কাপড় সেলাই করেন?



আজকাল আমাদের কায়িক শ্রমের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। এজন্য সহায়তা করছে প্রযুক্তি ও নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ভেবে দেখো, আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে মানুষ কীভাবে দূরের কোনো জায়গায় যেতেন? তাদের হয় পায়ে হেঁটে যেতে হতো না হয় গরু, মহিষ, ঘোড়া,

গাধা ইত্যাদিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে হতো। হাঁটলে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম হয়। হাঁটা কায়িক শ্রমের উদাহরণ। জলপথে গেলে হয়ত নৌকা ব্যবহার করতে হতো। নৌকার দাঁড় টানতে এবং নৌকা চালাতে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। অনেক কায়িক শ্রমের কাজ আমাদের হয়ে যন্ত্র করে দিচ্ছে। আজ আমরা বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করে খুব সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারি।

কায়িক শ্রম আমাদের দেহ ও মনের জন্য খুবই জরুরি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা নানা কাজ করে থাকি। এসব কাজ করতে আমাদের কায়িক শ্রম দিতে হয়। এসব কাজ আমাদেরকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত ও পরিমিত কায়িক শ্রম আমাদেরকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে রক্ষা করে। এ শ্রম শরীরের কার্যক্ষমতা ঠিক রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।



সুস্থান্ত্রের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই জরুরি। আর শুধু নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেই হবে না, আমাদের চারপাশও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আমরা আমাদের বাড়ি ঘর, চারপাশ, বিদ্যালয়, এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখব। বিদ্যালয় চতুর পরিষ্কার করা কায়িক শ্রমের উদাহরণ। আমাদের কায়িক শ্রমের ফলে চারপাশ এতো ঝকঝকে হয়েছে দেখে আমরা গর্বিত হবো।

## পাঠ ২ : কঠোর কায়িক শ্রমের নির্দর্শন

আমাদের এই সত্যতা মানবসমাজের কঠোর কায়িক শ্রমের ফল। লক্ষ লক্ষ মানুষের হাজার বছরের কঠোর পরিশ্রমে আমরা অর্জন করেছি আজকের এই উন্নত মানবসত্যতা। যুগে যুগে মানুষ এমন অনেক কিছু বানিয়েছে যা কঠোর কায়িক শ্রমের পরিচয় বহন করে। আজ আমরা তেমনি কিছু কীর্তির কথা জানব।

### মিসরের পিরামিড

মিসরের পিরামিডের নাম কি শুনেছ? মিসরের এই পিরামিডের কথা পৃথিবীর প্রায় সব লোকেই জানে। প্রাচীনকাল থেকে এসব পিরামিড পৃথিবীব্যাপী





টন। এসব পাথর আবার বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বহুদূর থেকে। কিছু কিছু পাথর টেনে আনা হয়েছে পাঁচশ কিলোমিটার দূর থেকে। কিছু পাথর নিয়ে আসা হয়েছে নদী পার করে। এসব পাথরের গড়ে ওজন ২৫-৮০ টন অর্থাৎ ২৫০০০-৮০০০০ কেজি।

আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে কোনো উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া কীভাবে মানুষ এই পিরামিড নির্মাণ করেছে তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার! সন্দেহ নেই কঠোর কার্যক শ্রমের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।



বিখ্যাত ছিল। মিসরের এই পিরামিডের বয়স প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর। পিরামিড তৈরিতে মানুষের যেমন লেগেছে কারিগরি জ্ঞান তেমনি প্রয়োজন হয়েছে কার্যক শ্রমের। শোনা যায় প্রায় এক লক্ষ লোকের বিশ বছর লেগেছে গিজার মহাপিরামিডটি তৈরি করতে। এই পিরামিড তৈরিতে যেসব পাথরখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে তাদের এক একটির ওজন কম করে হলেও কয়েক

### চীনের মহাপ্রাচীর

চীনের মহাপ্রাচীর মানবসভ্যতার অন্যতম কীর্তি যা লক্ষাধিক মানুষের কঠোর কার্যক শ্রমের ফসল। মোঙ্গলদের হাত থেকে চীন সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য চীনারা খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে এই মহাপ্রাচীর নির্মাণ শুরু করে। ৮৮৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মহাপ্রাচীর নির্মাণে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক শতাধিক বছর ধরে বিরামহীন

কার্যক শ্রম দিয়ে গেছেন।

### আগ্রার তাজমহল

তাজমহলের নাম কে না শুনেছে। সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মরণে এই স্থাপনা নির্মাণ করেন। এই তাজমহল যেমন স্তুরির প্রতি সম্মাট শাহজাহানের গভীর ভালোবাসার পরিচয় বহন করে তেমনি স্মরণ করিয়ে দেয় এ কীর্তি নির্মাণে হাজার হাজার মানুষের



কঠোর কায়িক শ্রমের কথা। তাজমহল মার্বেল পাথরের তৈরি যা বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে অনেক দূর থেকে। এসব পাথরকে প্রয়োজন মতো কেটে নকশা অনুযায়ী জায়গা মতো স্থাপন করা সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া এর অসাধারণ স্থাপত্য শৈলী, বিশাল নির্মাণযন্ত্র, শত শত বছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়িয়ে টিকে আছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে কঠোর কায়িক শ্রমের ফলে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সে সময় আজকের মতো এত উন্নত প্রযুক্তি ছিল না।

### পাঠ ৩ ও ৪ : কায়িক শ্রমের গল্প

আমরা সমাজে বাস করি। এই সমাজে আছে নানা পেশার মানুষ। কেউ শারীরিক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন কেউবা বুদ্ধিমত্তির চর্চা করে উপার্জন করে থাকেন। আমাদের চারপাশেই রয়েছেন এরকম হাজারো মানুষ। চল আজ আমরা কায়িক শ্রমে নিয়োজিত এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে তাঁর জীবনের কথা শুনব।

#### কাজ

##### প্রথম পর্ব

শিক্ষক কায়িক শ্রমে নিয়োজিত একজন ব্যক্তিকে অতিথি হিসেবে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসবেন। কায়িক শ্রমে নিয়োজিত ব্যক্তি হতে পারেন-

- একজন রিকশাচালক বা ভ্যানচালক
- ইট ভাঙা শ্রমিক বা নির্মাণশ্রমিক
- খেতমজুর কিংবা দিনমজুর
- কায়িক শ্রমে নিযুক্ত অন্য কেউ

শিক্ষার্থীরা তার কাছ থেকে তার জীবনের কথা শুনবে। তিনি কী কাজ করেন, কী খাওয়া-দাওয়া করেন, কোথায় থাকেন, কীভাবে এই কাজে এলেন, তার স্বপ্ন কী ইত্যাদি বিষয় শুনবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে সাহায্য করবেন। কাজ শেষে শিক্ষক অতিথির উপস্থিতিতেই শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন- যদি তিনি তার কাজে কঠোর কায়িক শ্রম না দিতেন তবে আমাদের সামাজিক জীবন কী রকম ঝুঁকির মুখে পড়ত। এভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট কায়িক শ্রমের গুরুত্ব তুলে ধরবেন।

- এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

#### কাজ

##### দ্বিতীয় পর্ব

ক্লাস শেষ করার পূর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। তবে যদি শিক্ষক মনে করেন তাহলে কাজটি শিক্ষার্থীদের এককভাবেও দিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ কায়িক শ্রমে নিয়োজিত অতিথির পেশা নির্দেশ করে ছবি আঁকবে, কেউ কেউ গল্প লিখবে, কেউ কেউ কবিতা বা গানও লিখতে পারে।

এসব লেখা ও ছবি একসাথে করে একটি দেয়াল পত্রিকা বানিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করতে হবে।

- এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

## পাঠ ৫ ও ৬ : মেধাশ্রমের গুরুত্ব

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা মেধাশ্রম কী এবং মেধাশ্রমের উদাহরণ সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা জানব কেন মেধাশ্রম এত গুরুত্বপূর্ণ।

মেধা ব্যয় করে আমরা যে কাজ করে থাকি সে কাজকেই আমরা মেধাশ্রম হিসেবে জানি। মেধা ব্যয় হয় নানা ধরনের কাজে। এরকমই একটি কাজ হলো ইতিহাস লেখা। ইতিহাস হলো মানবসমাজে ঘটে যাওয়া প্রতিদিনের ঘটনার একটি সারসংক্ষেপ। বিশেষ বিশেষ ঘটনা গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়। ইতিহাসের ব্যাপ্তি যথেষ্ট বিস্তৃত। আমাদের, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক সকল কিছুই ইতিহাসের বর্ণনার মধ্যে আসতে পারে। এত কিছু বিবেচনা করে ইতিহাস লেখা সহজ নয়। অনেক মেধা খাটিয়ে তা লিখতে হয়। তাই ইতিহাস আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি আগেকার মানুষ কেমন করে বাঁচতো, কী খেতো, কী পরতো, কী খেলতো, কোন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো। যে সময়কার মানুষ ইতিহাস লিখতে পারতো না বা যাদের লেখা ইতিহাস আমরা পাই নি তাদের সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানতে পেরেছি। কাজেই ইতিহাস লেখার কাজে মেধাশ্রমের ব্যবহার আমাদের



অনেক উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করে। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে লেখা গল্প ও কবিতা থেকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, কারা, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, কারা আমাদের সাহায্য করেছেন এসব আমরা জানতে পারি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা নানা স্মৃতিকথা, কবিতা ও গল্প থেকে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা গল্প কবিতা-গান ইত্যাদি লিখেছেন তাদের মেধাশ্রমের কারণেই আমরা অতি সহজে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

ছবি আঁকা এক ধরনের মেধাশ্রম। ছবির মাধ্যমেই শিল্পী রংতুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন মুহূর্তের জনজীবন এবং জনজীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা। এসব ঘটনা আমাদের অনেক কিছু জানতে সাহায্য করে।

ছবি-গল্প-কবিতা থেকে আমরা পুরনো দিনের মানুষের জীবন সম্পর্কে জানতে পারি। গল্প-কবিতা লেখা, ছবি আঁকা সবই মেধাশ্রমের উদাহরণ।



আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে প্রতিদিন বাতি জ্বালাই, পাখা চালাই সেই বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়েছে মেধাশ্রমের ফলেই। যে পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজি, যে সাইকেল, রিকশা, ভ্যান বা মোটরগাড়ি ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করি এই সবকিছুই আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে মেধাশ্রম দিয়েই।

আমরা সবাই বই পড়ি। বই পড়ে অনেক কিছু শিখি। বই পড়ে নানা কিছু শেখা মেধাশ্রমের উদাহরণ। সর্বোপরি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধাশ্রম প্রয়োজন। মেধাশ্রম ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাই মেধাশ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনন্ধিকার্য।

### কাজ

‘মানবসভ্যতা বিকাশে মেধাশ্রমের ভূমিকাই মুখ্য’-এ বিষয়ে বিতর্ক আয়োজন।

- বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

## পাঠ ৭ ও ৮ : মেধাশ্রমের অনুশীলন

মনে কর, ছবির ক্লাসটি তোমার নিজের। তোমার শিক্ষক তোমাদের কাছে মেধাশ্রমের কিছু উদাহরণ জানতে চাইলেন। তুমি ছবির শিক্ষার্থীদের হয়ে উত্তর করার জন্য ফাঁকা বক্সে তোমার উত্তর লিখ।



### কাজ : ছবি দেখে বলা

নিচের ছবিটি লক্ষ কর। তোমরা কি বলতে পারবে ছবিটি কখনকার? কী ঘটনার পরিচয় বহন করে, কবে ও কোন দেশের-ছবিটি দেখে তোমার অনুভূতি কী? তোমার নিজের খাতায় এ প্রশ্নের উত্তর লিখ।

শিক্ষক সবার লেখার পর ছবিটির পেছনে যে মেধাশ্রম দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।

ছবিটি থেকে আমরা কী জানতে পারি, ছবিটি না থাকলে আমরা কী জানতে পারতাম না ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন।

(যেমন- ছবিটি না থাকলে আমরা জানতে পারতাম না যে কিশোরেরাও মুক্তিযুদ্ধ করেছে)

\*\*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।



### কাজ

ছবিটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা দাও।

## পাঠ ৯ : মেধাশ্রমের গল্প

পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা তাদের মেধাশ্রমের কারণে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা মানুষের মুক্তির জন্য, কল্যাণের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। অর্জিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর মেধাশ্রম দিয়ে তাঁরা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন মুক্তির পথ, অগ্রগতির পথ।

### কাজ

তোমার এলাকার/পরিচিত কোনো ব্যক্তির মেধাশ্রমের ব্যাপারে একটি অনুচ্ছেদ লিখ এবং তা শিক্ষককে দেখাও। তোমার লেখা অনুচ্ছেদ তোমার সহপাঠীদের পড়তে দাও, তাদের লেখাটিও তুমি পড়।



আনা ফ্রাংক ১৯২৯ সালের ১২ই জুন জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে ইহুদিদের উপরে নির্যাতন এতো বেড়েছিল যে তাঁর পরিবার নেদারল্যান্ডসের অ্যামস্টারডাম শহরে পালিয়ে আসে। ১৯৪০ সালে সেই শহরও নার্থসি বাহিনী দখল করে নেয়। তখন আনা ফ্রাংকের পরিবার একটি বাড়ির গোপন কুঠুরিতে আত্মগোপন করে। ত্রয়োদশ জন্মদিনে উপহার পাওয়া একটি ডায়েরি কিশোরী আনা ফ্রাংক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ১২ই জুন ১৯৪২থেকে ১লা আগস্ট ১৯৪৪ পর্যন্ত সময়টিকে তুলে ধরেছেন। বিশ্বযুদ্ধের এমন হৃদয়স্পৰ্শী ও মর্মান্তিক লিখিত বর্ণনা আনা ফ্রাংকের আগে আর কেউ করেন নি।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা আগস্ট গোপন কুঠুরির সবাই ধরা পড়ে যান। তাঁর বাবা অটো ফ্রাংক ছাড়া সবাই বন্দিশিবিরগুলোয় মৃত্যুবরণ করেন।

আনা ফ্রাংক জার্মানির হ্যানোভার শহরের বার্জেন-বেলসন বন্দিশিবিরে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আনার দিনলিপিগুলো ১৯৪৭ সালে তাঁর বাবা ডাচ ভাষায় প্রকাশ করেন। বইয়ের নাম দেন ‘হেট অ্যাকটারবুস’ (বাংলায় ‘গোপন কুঠুরি’)। পরে বইয়ের নাম পাল্টে রাখা হয় আনা ফ্রাংকের ডায়েরি। কেউ কেউ এটির নাম দেন ‘দি ডায়েরি অব এ ইয়ং গার্ল’। এ পর্যন্ত প্রায় ৭০টি ভাষায় আনা ফ্রাংকের ডায়েরির কয়েক শত সংক্রান্ত প্রকাশিত হয়েছে। কিশোরী লেখিকা তাঁর দেখা ও শোনা প্রতিদিনের ঘটনাসমূহের বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন হিটলারের হাতে অবরুদ্ধ থাকা দুঃসহ দিনগুলোর কথা। বিশ্বযুদ্ধের সেই দিনগুলোর বর্ণনা লিখতে গিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে, ভাষার যথাযথ ব্যবহার করতে হয়েছে এবং জীবন্ত কথাগুলোকে গুছিয়ে লিখতে হয়েছে। এছাড়া আনা তার দিনলিপি একদল কাল্পনিক বন্দু-বান্ধবীকে উদ্দেশ করে

লিখেছেন - এখানেই তাঁর চমৎকার কল্পনা শক্তির প্রমাণ পাই আমরা। কাজেই আনা ফ্রাংকের ডায়েরি তাঁর মেধাশ্রমের উদাহরণ।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন দুর্ভিক্ষ নিয়ে অনেকগুলো ছবি এঁকেছেন। বাংলা ১১৭৬ সালে এদেশে অনেক বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ঐ দুর্ভিক্ষে এই ভূখণ্ডের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ (প্রায় এক কোটি) মানুষ মারা গিয়েছিলেন। এরপরও বাংলায় অনেকবার দুর্ভিক্ষ হয়। বাংলা ১৩৫০ এর ময়স্তর নিয়ে তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন। সেসব ছবি থেকে আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি কতটা কষ্ট হয়েছিল সেসময় মানুষের, কতটা কর্ণ ও হৃদয়বিদ্বারক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি আমরা। দুর্ভিক্ষের সেসব ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে অনেক মেধাশ্রম দিতে হয়েছে। এসব মেধাশ্রম আমাদের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। অতীতে ঘটে যাওয়া নানা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে আমাদের চোখে জীবন্ত করে তোলে। আমরা সেইসব ঘটনা বা দিনের কথা জানতে আগ্রহী হই। অতীতের সে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি যা আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও বেশি নিরাপদ ও কল্যাণমুখী করে। তাছাড়া আমরা নিত্য যে সব সমস্যার মুখোমুখি হই তা সমাধানে বা দূর করার জন্যও প্রয়োজন হয় মেধাশ্রম।



### পাঠ ১০ : আত্মর্যাদা বজায় রেখে কাজ করা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের তাই রয়েছে প্রথম আত্মর্যাদাবোধ। সমাজে আমরা সবাই মিলেমিশে বাস করি। নানা পেশার মানুষ, নানা বয়সের মানুষ, নানা ধর্ম-নানা জাতের মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের আত্মর্যাদাবোধ বজায় রেখে কাজ করা প্রয়োজন।



যারা দুর্নীতি করে, সবাই তাদের খারাপ বলে। যারা দুষ খেয়ে অন্যায় কাজে মানুষকে সাহায্য করে তাদের সবাই ঘৃণা করে, মন্দ বলে। যারা আত্মর্যাদাবান মানুষ তারা অন্যের কাছে ছোটে হতে চায় না, জনসমাজে লজ্জা পেতে চায় না। তাই তারা কখনো অন্যায় কোনো কিছু করে না, মন্দ কাজ এড়িয়ে চলে। যাদের আত্মর্যাদাবোধ নেই তারাই এসব হীন কাজ করে। যাদের আত্মর্যাদা রয়েছে তারা কখনো পরীক্ষায় অন্যের খাতা দেখে লেখে না। কারণ তারা মনে

করে অন্যের খাতা দেখে লেখা চুরি করার শামিল। একজন আত্মর্যাদাবান মানুষ কখনো কিছু চুরি করতে পারে না।

অনেকে মনে করে কায়িক পরিশ্রমের কাজ করা মর্যাদা হানিকর। তারা নিজের কাজ নিজে করতে চায় না। একবার ভেবে দেখো তো, রিকশা চালানো পরিশ্রমের কাজ ভেবে সবাই যদি রিকশা চালানো বন্ধ করে দেয় তাহলে আমাদের কী হবে? আসলে কোনো কাজই মর্যাদা হানিকর নয়। সকল কাজই মর্যাদাপূর্ণ। যারা নিজের কাজ নিজে করে না তারা আসলে আত্মর্যাদাবান নয়। তোমার খাবার যদি অন্য কেউ খায় তাহলে কি তোমার ক্ষুধা মিটবে? তোমার



ঘুম যদি অন্য কেউ ঘুমায় তবে কি তোমার ক্লাস্টি মিটবে? তোমার খাবার যদি তুমিই খাও, তোমার ঘুম যদি তোমাকেই ঘুমাতে হয় তবে তোমার কাজতো তোমারই করা উচিত, তাই না?

এখন বলো দেখি নিচের ছবিতে আত্মর্যাদার বিষয়গুলো কীভাবে ফুটে উঠেছে?



## পাঠ ১১ ও ১২ : চল আত্মর্যাদাবান হই

আগের পাঠে আমরা আত্মর্যাদার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনেছি। এই পাঠে আমরা একজন আত্মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রত্যেকের আত্মর্যাদাবান হওয়া প্রয়োজন। একজন আত্মর্যাদা সম্পন্ন মানুষের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

একজন আত্মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো অন্যের জিনিস না বলে নেন না। আমরা কখনো অন্য কারও জিনিস তাকে না বলে নেব না।

একজন আত্মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ সবসময় অন্যকে সম্মান করেন। আমরা সবসময় অন্যকে সম্মান করব।

একজন আত্মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কখনো কারও সাথে বাগড়া-বিবাদে লিঙ্গ হন না, মারামারি করেন না।

একজন আত্মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কখনো অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করেন না; কেউ অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করছে দেখলে ভদ্রভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেন।

একজন আত্মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কখনো মিথ্যা বলেন না। আমরা কখনো কারও সাথে মিথ্যা বলব না।

একজন আত্মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী কখনো অন্য কারও লেখা দেখে লেখে না, পরীক্ষায় বই দেখে লেখে না। আমরাও কখনো অন্য কারও লেখা দেখে লিখব না বা পরীক্ষায় বই দেখে লিখব না।

একজন আত্মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ সবসময় অন্যকে সম্মান করেন, কখনো কাউকে কষ্ট দেন না; যার যা প্রাপ্য তাকে তা-ই দেবার চেষ্টা করেন।

একজন আত্মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ সবসময়ই নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। তিনি কখনো এমন কোনো কাজ করেন না যা তার মর্যাদা নষ্ট করে।

### কাজ

প্রত্যেকে নিজের পরিচিত একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ সম্পর্কে ২-৩ মিনিট কথা বলবে।

\*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

## আত্মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া কেন জরুরি?

আমাদের সবার আত্মর্যাদাবান হওয়া উচিত।

আত্মর্যাদাহীন মানুষ একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না। যার আত্মসম্মান নেই সে যে কোনো অন্যায় করতে পারে, দুর্নীতি করতে তার বাধে না, অন্যের জিনিস না বলে নিতেও তার সঙ্কোচবোধ হয় না। যারা এসব করে তাদের আত্মর্যাদাবোধে ঘাটতি রয়েছে। আমাদের চারপাশে এমন অনেকে আছে যারা নানা ধরনের দুর্নীতির সাথে যুক্ত। যারা

জনসাধারণের সম্পদ নষ্ট করে নিজের উদর পূর্তি করে- তাদের আত্মর্যাদা নেই। একজন আত্মর্যাদাবান ব্যক্তি অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ দেখায় না। একবার ভেবে দেখো তো, সবাই আত্মর্যাদা নিয়ে চললে দেশ ও সমাজের চিত্র কেমন হতো?

ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বদেশ। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমাদের করতে হবে। লাখো শহিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন আত্মর্যাদাবান মানুষ। আত্মর্যাদাবান মানুষ একদিকে যেমন নির্ভীক দেশপ্রেমিক হয় তেমনি সৎ, সাহসী ও পরিশ্রমী হয়। স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের তাই প্রয়োজন যোগ্য ও আত্মর্যাদাবান নাগরিক।

দেশের নাগরিক হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। একজন আত্মর্যাদাবান নাগরিক দেশের নিয়ম-কানুন ঠিকভাবে পালন করেন। দেশের উন্নতি তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের সব নাগরিক যথাযথভাবে দেশের নিয়ম-কানুন পালন করবে। আমরা সবাই আমাদের দেশকে অনেক ভালোবাসি। আমরা সবাই চাই আমাদের দেশ হয়ে উঠক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্নে দেখা বাংলাদেশ। তাই আমাদের প্রত্যেকের আত্মর্যাদাবান হওয়া উচিত।

### পাঠ ১৩ : কাজে সফলতা ও আত্মবিশ্বাস

কাজের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে আত্মবিশ্বাসের উপর। যষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা শিখেছি আত্মবিশ্বাস হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস। তবে সে বিশ্বাস কিন্তু অতি বিশ্বাস নয়। কাজে আত্মবিশ্বাস থাকলে আমরা যে কোনো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারি। আত্মবিশ্বাস কীভাবে মানুষের কাজে সফলতা আনে তার বহু নজির আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই।



তোমরা কি রবার্ট ক্রসের কাহিনি জানো? তিনি খুব ভালো একজন যোদ্ধা এবং যোগ্য রাজা ছিলেন। শক্ররা ঘড়যন্ত্র করে তাঁর রাজ্য থেকে তাঁকে বিতাড়িত করে। তিনি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁর শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পর পর পাঁচবার যুদ্ধে তিনি তার শক্রদের কাছে পরাজিত হন। পঞ্চম যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর আশা ভরসা একেবারে শেষ হয়ে যায়। শক্রদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি আশ্রয় নিলেন এক গুহার ভেতর। সেখানে এক মাকড়সা তাকে নতুন করে যুদ্ধ করার আত্মবিশ্বাস এনে দিলো। তিনি দেখলেন একটি মাকড়সা বার বার পড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত প্রবল চেষ্টায় দেয়ালে উঠতে পারল এবং তার জাল বোনা শেষ করল। এ ঘটনা ক্রসের মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস এনে দিল। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং তাঁর শক্রদের পরাজিত করলেন। তাঁর এ বিজয় সম্ভব হয়েছিল প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারণে।



ইতিহাসে আছে যে, ইথিতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি মাত্র ১৭জন অগ্রবর্তী সৈন্য নিয়ে নবদ্বীপ (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার একটি শহর) জয় করেছিলেন। নদীয়ার বিশাল সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে কেউই তখন লড়তে সাহস পেতো না। খলজির অভিনব রণকৌশল, অসম সাহস আর প্রবল আত্মবিশ্বাসের জোরেই সম্ভব হয়েছিল সে বিজয়। রণকৌশল আর যত সাহসই থাক, আত্মবিশ্বাস না থাকলে কিন্তু কিছুই সম্ভব হতো না।

সবুজ থামের দরিদ্র কৃষকের সন্তান। তার খুবই পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তারা বেশ গরিব প্রায়ই রহিমের মনে হয়, আর বেশি দিন হয়তো স্কুলে যাওয়া হবে না। এ কথা ভাবতেই বুক ভেঙে কান্না আসে তার। একদিন শিক্ষক বললেন, এবার পরীক্ষায় যে প্রথম হবে তাকে বৃত্তি দেওয়া হবে। সবুজের গৃহশিক্ষক নেই, কোনো বড় ভাই-বোনও নেই। মন কাঁপে দুর্দুর। তবু সবুজ আত্মবিশ্বাসী



হয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা শুরু করল। কঠোর পরিশ্রমে পড়াশোনা করে ঠিকই সে পরীক্ষায় প্রথম হলো এবং বৃত্তি পেল। সবাই বুঝলো, ভালো ফলাফল করার জন্য গাইড বইয়েরও দরকার নেই, গৃহশিক্ষকেরও দরকার নেই; প্রয়োজন শুধু প্রবল আত্মবিশ্বাস আর কঠোর পরিশ্রম। এ গল্পগুলো কিন্তু নিছক গল্প নয়, সত্য কাহিনি। এইসব সত্য কাহিনি থেকে আমরা কী বুঝলাম? আমরা বুঝতে পারলাম, কাজে সফলতার জন্য আত্মবিশ্বাস খুবই জরুরি। আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হলে অনেক অসাধ্যও সাধন করা যায়। সফল হতে হলে আত্মবিশ্বাসের কোনো বিকল্প নেই।

### পাঠ ১৪ - ১৬ : এসো আত্মবিশ্বাসী হই

আত্মবিশ্বাসী হতে হলে আমাদের জানতে হবে আত্মবিশ্বাসী এবং কম আত্মবিশ্বাসীদের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা কোন দলে পড়ি। আমরা যদি আত্মবিশ্বাসী হই তাহলে নিজেদের আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সমাজের জন্য, দেশের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি আমরা কম আত্মবিশ্বাসীদের দলে পড়ি তাহলে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে। তাহলে আমরা দেশ ও দেশের কল্যাণে কাজে লাগতে পারব। এসো এখন আমরা আত্মবিশ্বাসী ও কম আত্মবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যায় তা বোঝার চেষ্টা করি-

আত্মবিশ্বাসী মানুষ	কম আত্মবিশ্বাসী মানুষ
অন্যের কথা শুনেই প্রভাবিত হয় না। আগে তা বুঝে, ভেবে তারপর সিদ্ধান্ত নেয় বা কাজ করে।	অন্যরা যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করে না, ভেবে-চিন্তেও দেখে না।
সবসময় নিত্য নতুন ভালো কাজ অংশ নিতে প্রস্তুত থাকে এবং সুযোগ পেলেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।	নতুন কিছু করতে ভয় পায়, কোনো কাজে অংশ নিতেও ভয় পায়।
নিজে কোনো ভুল করলে তা স্বীকার করে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।	নিজের ভুল স্বীকার করতে ভয় পায়, সবসময় ভুলগুলোকে ঢেকে রাখতে চায়।
পরিবর্তনের কথা শুনেই ভয় পেয়ে যায় না; সম্ভব হলে অংশগ্রহণ করে।	যে কোনো পরিবর্তনের কথা শুনেই ভয় পেয়ে যায়।
যারা আত্মবিশ্বাসী তারা অন্যের কথা বা মতামতকে মূল্যায়ন করে; সবার সাথে বিনয়ী আচরণ করে।	যারা কম আত্মবিশ্বাসী তারা অন্যের কথা শুনতে চায় না। অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় না। তারা আসলে অন্যের কথা বা মতামত শুনতে ভয় পায়।
বুঁকি নিতে ভয় পায় না, বরং বুঁকি থাকলে খুব সাবধানী হয়ে সামনে এগিয়ে যায়।	যেকোনো বুঁকি নিতে ভয় পায়, বুঁকির ভয়ে কাজ এড়িয়ে চলে।
ভালোর কোনো শেষ নেই, কাজেই সবসময় আরও ভালো করার চেষ্টা করে।	এদের মধ্যে কাজ ফেলে রাখার মানসিকতা দেখা যায়।

### কাজ

আমরা তো সবাই কমবেশি আত্মবিশ্বাসী, তাই না? এসো আজ আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের জীবন থেকে একটি করে গল্ল/ঘটনা লিখব যেখানে আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু আত্মর্যাদাবান, আর যারা আত্মর্যাদাবান তারা অন্যের লেখা দেখে লেখে না। যারা নিজে নিজে লেখার চেষ্টা করে না তারা কিন্তু আত্মর্যাদাবান নয়।

লেখা শেষ করে আমরা সবাই মিলে শান্ত হয়ে বসব। শিক্ষক আমাদের একজন একজন করে নিজের লেখা পড়ে শোনাতে বলবেন। আমরা সবাই শিক্ষকের কথা শুনব এবং সে অনুযায়ী কাজ করব। লেখা শেষে আমরা সবাই মিলে আমাদের লেখাগুলো দিয়ে খুব সুন্দর দেয়াল পত্রিকা তৈরি করব। অথবা আমরা আমাদের লেখাগুলো আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় লিখে সেলাই করে বইও বানাতে পারি। শক্ত কাগজের মলাট বানিয়ে তার উপর গমের নাড়া বা রং দিয়ে বইয়ের নাম লিখতে পারি। বইয়ের নাম দিতে পারি- “আত্মবিশ্বাসী আমরা”।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** দেয়াল পত্রিকা তৈরি বা বই বানানোর কাজটি আমরা সবাই মিলে শ্রেণিতে বসে করব। বাড়ির কাজ হিসেবে নেব না বা একজন শিক্ষার্থীর উপর দায়িত্ব দিয়ে সবাই নিজেকে অলস প্রমাণ করব না।  
 \* এ কাজে তিনটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

বাদল খুব আত্মবিশ্বাসী। তোমাদের মতো সেও তার জীবনের একটি ঘটনা বলবে যেখানে আমরা তার আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাব। চলো আমরা বাদলের মুখ থেকে শুনি-

আমার নাম বাদল। আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। আজ আমি আমার জীবন থেকে আত্মবিশ্বাসের একটি গল্ল বলবো। একবার আমাদের গ্রামে খুব বাড় হলো। বাড়ে উড়ে গেলো বড়ে বড়ে গাছ। বেশিরভাগ ঘরের চাল উড়ে গেল। এত বড়ে বাড় কেউ নাকি আগে দেখে নি। আহত হলো অনেক মানুষ। বড়ো রাস্তায় গাছ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল। কীভাবে এই আহত মানুষের চিকিৎসা হবে, কীভাবে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাবে- তা নিয়ে সবাই চিন্তা করছে। গ্রামের মোড়ে সমবেত হয়ে সবাই পরামর্শ করছেন কী করা যায়।

সবার মন খারাপ, আহত লোকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা প্রয়োজন কিন্তু কোনো উপায় বের করা যাচ্ছে না। আমার মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি এলো। আমি সবার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম- আমি হাসপাতালে গিয়ে ডাঙ্কার ডেকে আনতে পারি। আমার খুব ভয় করছিল, সবাই ভাবছিল আমি যেতে পারব কি না। আমি বললাম, “আহতদের চিকিৎসা করা দরকার, বড়োরা সবাই মিলে যদি তাড়াতাড়ি ঘর-বাড়ি ঠিক না করে তাহলে আবার বৃষ্টি এলে খুব সমস্যা হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি খুব ভালো দৌড়াতে পারি। আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না, শহর তো মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে। আমি ঠিকই ডাঙ্কার ডেকে আনতে পারব”。 আমার একথা শুনে গ্রামের এক মুরুবির আমার হাতে ডাঙ্কার সাহেবকে লেখা একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে যেতে বললেন। তিনি সুস্থ সবাইকে গ্রামের ঘর-বাড়ি ও রাস্তা-ঘাট মেরামতের জন্য কাজে লেগে যেতে বললেন। আমি ২ ঘণ্টা পর ডাঙ্কার সাহেব আর তার ব্যাগ ভর্তি ওষুধ-পত্র নিয়ে ফিরলাম। গ্রামের সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। মুরুবিরা বললেন, “বাদল আমাদের গর্ব”।

## পাঠ ১৭ : কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা শিখেছি যে সৃজনশীলতা বলতে যেমন নতুন কিছু সৃষ্টি করা বোঝায় তেমনি কোনো কাজ নতুন উপায়ে করাকেও বোঝায়। আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে সৃজনশীল। অনেকে আছে অন্যকে অন্দের মতো অনুকরণ করে। এটা কিন্তু সৃজনশীলতা নয়। সৃজনশীলতা হলো নিজের মতো করে কিছু করা, সবার চেয়ে আলাদা কিছু করা।



বিজ্ঞানীরা সৃজনশীল। তাঁরা এমন অনেক জিনিস তৈরি করেন যা আগে কখনো ছিল না। এমন অনেক জিনিস তাঁরা তৈরি করেন যেগুলোর কথা মানুষ আগে ভাবে নি। তাঁরা এসব জিনিসের কথা ভাবতে পারেন, তৈরি করতে পারেন বলেই তাঁরা সৃজনশীল।

আচ্ছা, আমরা কি ভাবতে পারি যে, হাতি আকাশে উড়বে? ভাবতেই কেমন হাস্যকর লাগে, তাই না? প্রাচীনকালের মানুষেরা হয়ত ভাবত আহা, হাতি যদি আকাশে উড়ত তাহলে আমরা হয়ত হাতির পিঠে চড়ে উড়ে বেড়াতে পারতাম। বিজ্ঞানীরা মানুষের এই স্মপ্তকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আজ আমরা বিমানে চড়ে আকাশ ভ্রমণ করতে পারি। এমনকি রাকেটে চড়ে মহাকাশেও পাড়ি দিতে পারি। এসবই সম্ভব হয়েছে কাজে সৃজনশীলতার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে।

বিজ্ঞানীরা কেন সৃজনশীল? কারণ তাঁরা মানুষের স্মপ্তকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করেন। আমাদের চারপাশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আরও ভালো কিছু তৈরির চেষ্টা করেন। আমাদের জীবনকে আরও সহজ, নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন সামগ্ৰী তৈরি করেন। এই নিত্য নতুন জিনিস তৈরির জন্য সৃজনশীলতা প্রয়োজন। যেমন ধরো-বাইসাইকেল, যা আমরা সাইকেল নামে চিনি, খুবই প্রয়োজনীয় একটি বাহন। সাইকেলে ভারসাম্য রাখা বেশ কঠিন। আবার বেশি মালামাল বা মানুষ বহনও করা যায় না। তাই বিজ্ঞানীরা সাইকেলে আর একটি বেশি চাকা যোগ করে দিলেন; হয়ে গেল ট্রাইসাইকেল। আজকালকার ভ্যান, রিকশা ইত্যাদি ট্রাইসাইকেলের সুপরিচিত উদাহরণ। আর এই চাকা যোগ করা কিন্তু সৃজনশীলতার একটি ফর্মা ৩, কর্ম ও জীবননুরী শিক্ষা- ৭ম শ্রেণি



বড়ো উদাহরণ। আবার সময়ের সাথে সাথে আবিস্কৃত হয়েছে মোটর ইঞ্জিন। সাইকেলের সাথে মোটর ইঞ্জিন জুড়ে দিয়ে আমরা পেয়েছি মোটরসাইকেল। কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের সৃজনশীলতা আমাদের সভ্যতাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে মানুষ কোনো না কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করেছে; তারপর ধীরে ধীরে ঐ যন্ত্রটা উন্নত করেছে। আবার একই যন্ত্র দিয়ে যাতে অনেক কাজ করা যায় সেজন্য মানুষ বের



করেছে নানা বুদ্ধি। যেমন ধরো মোবাইল টেলিফোন। মোবাইলফোন নামের এই ছোট যন্ত্রটি দিয়ে আমরা যেমন কথা বলতে পারি তেমনি গান শুনতে পারি, করতে পারি হিসাব-নিকাশ, টুকে রাখতে পারি কোনো তথ্য, মেসেজ পাঠাতে পারি, ভিডিও দেখতে পারি, গেমস খেলতে পারি এমন কি ইন্টারনেটও ব্যবহার করতে পারি। একদিনেই মোবাইলফোন এতো উন্নত হয়ে যায় নি।

দিনের পর দিন শত শত মানুষ যারা মোবাইলফোন তৈরির কাজে যুক্ত, তাদের কাজে সৃজনশীলতা প্রয়োগের মাধ্যমেই আজ আমরা এক মোবাইলফোনের ভেতর এতো কিছু পেয়েছি। তাছাড়া মোবাইলফোনের চেহারাতেও আছে বৈচিত্র্য। নানা রং, নানা ডিজাইন। যারা মোবাইলফোনের ডিজাইন করেন তাদের কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হচ্ছে নিত্য নতুন ডিজাইনের উন্নতি।

## পাঠ ১৮ - ২০ : সৃজনশীলতা কেন প্রয়োজন

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু কেন এবং কীভাবে মানুষ সৃষ্টির সেরা? পৃথিবীর সব প্রাণী খাবার সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করে, বেঁচে থাকার জন্য কষ্ট করে। একবার ভেবে দেখো, মানুষের চেয়ে বাঘ, সিংহ কিংবা হাতি কতো বেশি শক্তিশালী। তবুও হাতি মানুষকে নয় মানুষই হাতিকে নানা কাজে ব্যবহার করে। পাখি কতো সহজে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়। নীল আকাশই পাখির সীমানা। মানুষ নীল আসমান পার হয়ে পৌঁছে গেছে চাঁদে। মানুষ প্রকৃতির দানকে ব্যবহার করছে তার নিজের মতো করে। এ সবই সম্ভব হয়েছে তার সৃজনশীলতার কারণে।

গরমের দিনে প্রচণ্ড তাপে আমাদের ঠাণ্ডা পানির ত্বক্ষণ লাগে। তাই সৃজনশীল মানুষ তৈরি করেছে রেফ্রিজারেটর যা আমরা সংক্ষেপে ফ্রিজ নামে চিনি। আকাশের বিদ্যুৎকে বেঁধে নিজের কাজে লাগানো আজ আর কল্পনা নয়, একেবারে সত্যি। এটা সম্ভব হয়েছে মানুষের সৃজনশীল ভাবনা আর নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবনের ফলে।



তোমাদের চারপাশে যারা বসবাস করে তাদের সবার কাপড়-চোপড় কি একই রকম? দেখো কতো বাহারি রং, তাতে কতো রকম নকশা; একেকটা পোশাক আবার একেক রকম। গলার কাছে, লম্বায়, হাতার নকশায় পার্থক্য আছে তাই না? আচ্ছা কখনো কি ভেবে দেখেছো যারা এসব পোশাক বানায়, নতুন রকমের পোশাক, নতুন নকশা আর রং দিয়ে তারা এসব কীভাবে পারে? সৃজনশীল চিন্তা করে বলেই তারা পারেন। তোমাদের চারপাশের বাড়িয়ারগুলো দেখো। এক একটি বাড়ি-ঘরের নকশা বানাবার উপকরণ একেক রকম। এর মধ্যেও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। আবার দেখ, তোমাদের মধ্যে কেউ সবসময় বেশ পরিপাণি হয়ে থাকে, কেউ বা আর সবার চেয়ে



আলাদাভাবে চুল বাঁধে, কেউ বা খুব সুন্দর করে কথা বলে, কেউ বা কাগজ দিয়ে অনেক কিছু বানাতে পারে, কেউবা অন্য কারও গলা অনুকরণ করে কথা বলতে পারে, এসবই কিন্তু সৃজনশীলতার উদাহরণ। নতুনভাবে কিছু করার মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃজনশীলতা। এখন ভেবে দেখো, যদি সৃজনশীলতা না থাকত তবে হয়তো সবাই একই রঙের, একই নকশার, একই রকম পোশাক পরত, সব বাড়ি-ঘর দেখতে একই রকম হতো। সেটা হয়ত ভালো হতো না। তাহাড়া সৃজনশীলতা না থাকলে আমরা হয়ত আজও পাহাড়ের গুহায় বসবাস করতাম, কুড়ানো ফলমূল আর গাছের শেকড়-পাতা খেয়ে থাকতে হতো। এমনকি সৃজনশীলতা না থাকলে পোশাকও আবিষ্কার করা সম্ভব হতো না। কাজেই ভেবে দেখ, সৃজনশীলতা আমাদের কতো প্রয়োজন?

### কাজ

এসো প্রত্যেকে ছোট করে একটা অনুচ্ছেদ লিখি।

লেখার বিষয় : সৃজনশীল হয়ে আমি কী করতে চাই?

লেখা শেষ হলে সবাই নিজের লেখা সবার উদ্দেশে পড়ে শোনাই। সবার লেখা একত্র করে আমরা একটা বইও বানাতে পারি।

কীভাবে বই বানাবে : ক্লাসে যাদের হাতের লেখা সুন্দর তারা প্রত্যেকের লেখা আলাদা কাগজে লিখবে, যারা সুন্দর আঁকতে পারে তারা লেখার কাছিনি অনুযায়ী তাতে সুন্দর করে অলংকরণ করবে। এরপর সবগুলো কাগজ এক সাথে করে শক্ত কাগজের মলাট দিয়ে বাঁধাই করে নিবে। মলাটের উপর বইয়ের নাম দিয়ে সুন্দর প্রচ্ছদও এঁকে দিতে পারো।

- এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

**সংজনশীলতার অনুশীলন :** আমরা কিছু কাজ করবো যেগুলো আসলে সংজনশীলতার অনুশীলন।  
প্রথমেই এসো আমরা নিচের বামপাশের ছবির সাথে ডানপাশের পরম্পর সম্পর্কযুক্ত ছবি দাগ  
টেনে মেলাই-



### কাজ

উপরের ছবিগুলো থেকে যে কোনো একটি ছবি বেছে নাও। ছবির বস্তুটিসম্পর্কে নিজ নিজ খাতায় ১০-১২ টি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লিখ। অনুচ্ছেদের নিচে তুমি ঐ বস্তুর ছবি আঁকো এবং তাতে রং  
কর।

- এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মেধাশ্রমের উদাহরণ?

- ক. চিনের মহাথ্রাচীর নির্মাণ
- খ. আঘার তাজমহল তৈরি
- গ. সাইকেল-রিকশা চালানো
- ঘ. মোটরগাড়ি আবিষ্কার

২. যাঁরা আত্মবিশ্বাসী তাঁরা-

- i. ঝুকি থাকলেও কোনো কাজে পিছিয়ে যায় না
- ii. অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা দেখায় না
- iii. পরিবর্তনের কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় না

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. i      | খ. ii      |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন

পোলিও রোগে আক্রান্ত শিশু খলিলুর রহমানকে কবিরাজ দেখায় তার মা বাবা। কবিরাজের ভুল চিকিৎসায় শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে যায় দুই বছরের শিশু খলিল। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের অনেকেই তাকে বোঝা হিসেবে মনে করত এবং তাকে ভিক্ষাবৃত্তিতে লাগিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিত। কিন্তু তার মা বাবা তাদের পরামর্শ না শুনে তাকে স্কুলে পড়ালেখা শুরু করালেন। খলিল পড়ালেখায় আনন্দ খুঁজে পায় এবং চেষ্টা অব্যাহত রাখে। সকল বাধা অতিক্রম করে খলিল আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী।

ক. মেধাশ্রম কী?

- খ. আত্মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. সামনে এগিয়ে যেতে খলিলুর রহমানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা বর্ণনা কর।
- ঘ. প্রতিবেশীদের পরামর্শ না শোনার বিষয়ে খলিলুর রহমানের মা-বাবার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।